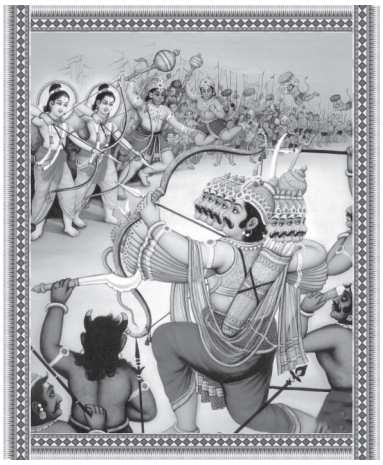

রাবণ : বাল্মীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক

কল্যাণ মুখার্জি

আদিকবির আদি শ্লোকটি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তমসা নদীর তীরে দুটি কোঁচ বক—ক্রৌঞ্চমিথুন বিহার করার সময় এক ব্যাধ এসে তাদের একটিকে হত্যা করে। তার সঙ্গী তার জন্য অত্যন্ত করুণস্বরে কাঁদতে থাকে। ঋষি বাল্মীকি এই ঘটনা দেখে কাতর হয়ে বলেন, ''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।/ যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ (২।১৫)।'' —ওরে ব্যাধ, তুই কোনওদিন সংসারে প্রতিষ্ঠা পাবি না, কারণ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে তুই কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

শোকের আবেগে সৃষ্ট এই শ্লোকই আদি শ্লোক। বকদুটিকে যদি রামসীতার প্রতীক বলে ধরা যায়, তাহলে তাদের বিচ্ছিন্ন করল ব্যাধ তথা রাবণ। এ-শ্লোকেই যেন সমগ্র রামায়ণের কাহিনির সারাৎসার লুকিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝটপটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।''[১]

বিপরীত দিক থেকে ভাবা যাক। রাবণ চরিত্রটি না থাকলে রামায়ণ কেমন লাগবে? রামায়ণের কোনও আকর্ষণ আমরা কি আদৌ অনুভব করব? বালকাণ্ড আর অযোধ্যাকাণ্ডের পর কাহিনি এগোবে কী করে! রাবণ ছাড়া রামায়ণ কল্পনা করাও অসম্ভব। সহস্র ভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদের নাম কে জানত যদি না হিরণ্যকশিপু থাকত, দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য কীভাবে বর্ণিত হত যদি না মহিষাসুর থাকত! তাই রামের আগেই রাবণকে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বাল্মীকি রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের একত্রিশ-তম সর্গে আমরা প্রথম রাবণকে দেখতে পাই। অকম্পন নামে এক রাক্ষস লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে জানায়, রাম-লক্ষ্মণ বধ করেছে খর-দূষণ সহ অন্যান্য রাক্ষসকে, তাই রামকে শাস্তি দেওয়ার উপায় তার পত্নী সীতাকে হরণ করা। এরপর শূর্পণখাও রাম সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং সীতাহরণে রাবণকে প্রলুব্ধ করে। অরণ্যকাণ্ডে এভাবে রাবণকে হঠাৎ দেখার

সহকারী অধ্যাপক, মেজিয়া সরকারি কলেজ, বাঁকুড়া

আগে রাবণ কীভাবে দশগ্রীব থেকে রাবণ হয়ে উঠলেন তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

রাবণের মাতামহ ছিলেন সুমালী রাক্ষস। ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের পুত্র ছিলেন বিশ্রবা। বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ কুবের। তপস্যার জোরে তিনি ধনাধিপতি কুবের হিসাবে পরিচিত হন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে পুষ্পক রথ অর্জন করেন। ব্রহ্মা তাঁকে প্রাণিশূন্য সুন্দর লঙ্কা নগরীতে বাস করতে বলেন। সুমালী একদিন তাঁর রূপবতী কন্যা কৈকসী বা নিকষাকে নিয়ে ভ্রমণকালে পুষ্পকারোহী কুবেরকে দেখে মোহিত হলেন। কুবেরের মতো সর্বগুণান্বিত এক দৌহিত্র পাওয়ার বাসনা হল তাঁর। কৈকসী পিতার আদেশে এক সন্ধ্যায় মহর্ষি বিশ্রবার কাছে গিয়ে পুত্রসন্তান প্রার্থনা করলেন। বিশ্রবা রাজি হলেও জানালেন, যে-সময়ে তিনি সন্তান প্রার্থনা করেছেন তা অত্যন্ত অশুভ। তাই পুত্রের চেহারা হবে ভয়ানক। কৈকসীর পুত্রের দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, গায়ের রং নীলাভ কালো। দশটি মাথা বলে তার নাম হল দশগ্রীব—''দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি॥'' (উত্তরকাণ্ড, ৯।৩৩)

আসলে রাবণ সাধারণ বীর বা রাক্ষস হলে তাঁকে বধ করে রামের মহিমা প্রমাণ করা সম্ভব হত না। তাই রাবণকে এমন ভীষণ করে গড়ে তোলা হয়েছে—মানুষ বুঝেছে রাম যাকে তাকে হারাননি, একেবারে দশ মাথা কুড়ি হাতের রাক্ষসকে সংহার করেছেন। কিন্তু আদৌ রাবণের তা ছিল কী না তা প্রশ্নাতীত নয়। কারণ রাবণের মৃত্যুর সময় দেখা যায় বিভীষণ তাঁর মাথাটি, হাত দুটি দেখে কাঁদছেন (যুদ্ধকাণ্ড, ১০৯।৩)। মুকুটে একবচন এবং বাহুতে দ্বিবচনের প্রয়োগ এখানে দশ মাথা বা কুড়ি হাতকে বোঝায় না। বাল্মীকির রামায়ণে অবশ্য দশ মাথা কুড়ি হাতের উল্লেখও আছে (অরণ্যকাণ্ড, ৪৯।৮)। হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে ঢুকে রাবণকে কুড়িটা হাত ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখেননি (সুন্দরকাণ্ড, ১০।১৫)। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে হনুমান দেখেন—''কুড়ি চক্ষু বুজি নিদ্রা যায় লঙ্কেশ্বর।''

রাবণ তাঁর মা কৈকসীর কাছে জানতে পারেন তাঁরই বৈমাত্রেয় ভাই কুবের অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, সমগ্র লঙ্কা নগরী তাঁর, পুষ্পক রথের প্রভুও তিনি। দশগ্রীব আর কুবের একই পিতার সন্তান। জন্মাবধি দশগ্রীব দৈহিক ও মানসিকভাবে অসীম শক্তিশালী। কুবেরের প্রতি ঈর্ষায় তিনি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, শক্তিতে দাপটে তিনি কুবেরকে অতিক্রম করে যাবেন। মায়ের কাছে তিনি জানতে পারেন লঙ্কাপুরী একসময় তাঁদেরই ছিল, অত্যাচারী হওয়ায় বিষ্ণু তাঁদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। দশগ্রীব লঙ্কাপুরী পুনরায় উদ্ধার করার কথা মাকে জানান—''রাবণ বলে মা তুমি না কর বিষাদ,/ লঙ্কাপুরী জিন্যা লব তপের প্রসাদ॥'' (কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড) সেকালে বললাভের একমাত্র উপায় ছিল কঠিন তপস্যা। দশগ্রীব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যায় তাঁর অসীম নিষ্ঠা। গোকর্ণ পর্বতে গিয়ে তিনি তপস্যা করলেন দশ হাজার বছর। প্রতি একহাজার বছর অন্তর তিনি নিজের একটি করে মাথা কেটে দেন—''দশ হাজার বৎসর তপ করিল রাবণে।/ নয় মাথা কাটিয়া তপ কৈল দশাননে॥'' (পূর্বোক্ত) এভাবে দশম মাথাটি কাটতে যাওয়ার সময় ব্রহ্মা এসে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। তাঁর প্রার্থনামতো অমরত্ব বর দিতে ব্রহ্মা অস্বীকার করলে রাবণ এই বর লাভ করেন যে, দেব-দৈত্য-পক্ষী-গন্ধর্ব-যক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যু হবে না। নর-বানর তাঁর কাছে নগণ্য। তাই তাদের হাতে মৃত্যু না হওয়ার কথা তিনি প্রার্থনাতেই আনেননি। তাদের তিনি তৃণজ্ঞান করতেন—''তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ (উত্তরকাণ্ড, ১০।২০)।'' ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থনায় সম্মত হন এবং আরও বলেন, দশগ্রীব ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারবেন (পূর্বোক্ত, ১০।২৫)।

ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়ে দশগ্রীব ফিরে এসে প্রথমেই কর্তব্য পালন করে বোন শূর্পণখার বিবাহ দিলেন। দশগ্রীব মৃগয়ায় গিয়ে ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। নিজের বংশপরিচয় গর্বিত দশগ্রীব ময়দানবকে নিজ পরিচয় দেন ঋষি পুলস্ত্যের নাতি হিসাবে—''অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ।'' মাকে কী কথা দিয়েছিলেন তা মনে থাকলেও প্রথমেই কুবেরকে তিনি লঙ্কাচ্যুত করতে চাননি। বাল্মীকি দেখাচ্ছেন সুমালীর পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। কিন্তু আবার মাতুল প্রহস্ত একই কথা বললে তিনি লঙ্কা অধিকারের কথা ভাবলেন। ভদ্র বিনয়ী মহাজ্ঞানী কুবের দশগ্রীবকে লঙ্কার অধিকার ছেড়ে দিয়ে কৈলাসে বাস করতে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও ভাইয়ের হাত থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না তাঁর পুষ্পক রথটির জন্য। ব্রহ্মা প্রদত্ত পুষ্পক বিমানটির প্রতি দশগ্রীবের ছিল লোলুপ দৃষ্টি। তাই কৈলাসে গিয়ে কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি পুষ্পক হস্তগত করলেন। পুষ্পককে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে তিনি যেদিকে খুশি যেতে চাইলেন। কিন্তু রথ থেমে গেল কৈলাসের শরবনে। মহাদেবের অনুচর নন্দী তাকে সেখান থেকে ফিরে যেতে বললে দশগ্রীব নন্দীর বানরের মতো মুখ দেখে অবজ্ঞায় অট্টহাস্য করেন। নন্দী অভিশাপ দেন, ভবিষ্যতে এই বানরের হাতেই রাবণের বিনাশ হবে। দশগ্রীব নন্দীকে অগ্রাহ্য করে হাতে করে কৈলাস পর্বত তুলে ফেলতে চাইলেন, মহাদেব তখন পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন কৈলাস। সেই চাপে দশগ্রীবের হাত দুটি চাপা পড়ে গেল, তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর প্রচণ্ড রবে সারা বিশ্ব রাবিত (শব্দে কম্পিত) হল। মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য দশগ্রীব শুরু করলেন সামগান। সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর সামগান ও স্তবে তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেব। সেটিই 'শিবতাণ্ডবস্তোত্র' নামে পরিচিত। সন্তুষ্ট মহাদেব মুক্ত করে দিলেন দশগ্রীবের দুহাত। পর্বতের চাপে তাঁর ভয়ানক রবের জন্য মহাদেব দশগ্রীবের নাম দিলেন 'রাবণ'।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও এই নামের একটা ব্যাখ্যা আছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর বই থেকে জানা যায়, প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ওয়ালটার রুবেন ১৯৩৯ সালে দেখান যে 'রাবণ' শব্দটি সংস্কৃত নয়। এটি ওঁরাও ভাষায় ব্যবহৃত হত। সেই ভাষায় 'রাওণ' শব্দের অর্থ বৃহদাকার শকুন জাতীয় পাখি যাকে আমরা গৃধ্র বলি। লোভ এবং গৃধ্নুতার জন্য শকুনকে বলা হয় গৃধ্র। ওঁরাও তথা আসুরী ভাষায় 'রাওণ' শব্দের মধ্যে শকুনের বৃহত্ত্ব ও গৃধ্নুতার অভিসন্ধিটুকু আছে বলেই লঙ্কেশ্বর দশগ্রীবের উপর রাবণ উপাধিটি চেপে বসেছে।[২]

ক্রমে একের পর এক রাজ্য জয় করে সম্পদ ও পরস্ত্রীহরণ রাবণের নেশা হয়ে উঠল। লোভ ও কামরিপু তাঁর মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকল। সঙ্গে অহংকার। তাই এই সময়ে বেশ কিছু অভিশাপ কুড়োতে হয়েছিল তাঁকে। বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তপস্যারত বেদবতীকে রাবণ হরণ করতে চান। বেদবতী আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার আগে রাবণকে অভিশাপ দিয়ে যান, পরজন্মে তিনি সীতা হয়ে জন্মে রাবণের ধ্বংসের কারণ হবেন (উত্তরকাণ্ড, ১৭)। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অনরণ্য রাবণের কাছে যুদ্ধে কুৎসিতভাবে পরাস্ত হয়ে অভিশাপ দেন, তাঁরই বংশের রামের হাতে রাবণের পরাজয় ও নিধন হবে (পূর্বোক্ত, ১৯)। অপ্সরা রম্ভা বাগ্‌দত্তা ছিলেন কুবেরপুত্র নলকুবেরের কাছে। এক জ্যোৎস্নারাত্রে রাবণ তাঁর উপর বলপ্রয়োগ করলে নলকুবের রাবণকে শাপ দেন, ভবিষ্যতে কোনও নারীর উপর অত্যাচার করলে রাবণের মাথা সাত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে (পূর্বোক্ত, ২৬)। রাবণ অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলাকেও অপমান করলে ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দেন, ভবিষ্যতে কোনও নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর বলপ্রয়োগ করলে

রাবণের মাথা শতধা বিদীর্ণ হবে (যুদ্ধকাণ্ড, ১১-১৪)। এত অভিশাপ সত্ত্বেও রাবণ বিরত হননি।

অপহৃতারা সবাই যে তাঁর প্রতি আজীবন বিরূপ হয়েই ছিলেন এমনটাও নয়। তাঁর পৌরুষ, বিশালত্ব, বীরত্ব ও স্নেহে তাঁরা ধীরে ধীরে মুগ্ধ হয়েছিলেন পরবর্তী কালে। মন্দোদরী ছাড়াও রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব, রাক্ষসের কন্যারা তাঁর স্ত্রী ছিলেন। অপহৃতা হয়ে দীর্ঘদিন রাবণের কাছে থাকার ফলে বিলাসে তাঁরা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে ঢুকে রমণীদের চোখে মুখে এই তৃপ্তির ছায়া দেখেন। বাল্মীকি আরও লিখেছেন, 'ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্বা বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাং তু' (সুন্দরকাণ্ড, ৯।৭০)। অর্থাৎ সীতা ব্যতীত অন্যের গৃহীতা কোনও নারী রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্যের স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে আসার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়।

রাবণের পরাজয়ের আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। দিগ্বিজয়ের পরেও রাবণ পরাজিত হয়েছিলেন দুটি ক্ষেত্রে। কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীকে আক্রমণ করতে গেলে বালী তাঁকে বগলে ভরে নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেন। এছাড়া মাহিষ্মতী পুরীর হৈহয়বংশীয় রাজা কার্তবীর্যার্জুনের কাছে তিনি যুদ্ধে বিজিত হন এবং বন্দি হন। মহর্ষি পুলস্ত্য কার্তবীর্যার্জুনকে নাতির মুক্তির জন্য অনুরোধ করলে রাবণ মুক্তি পান। দুই ক্ষেত্রেই রাবণ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে সখ্য স্থাপন করেন। বিজয়ীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা মহৎ গুণ। রাবণের তখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, অজেয় তাঁকে একটা মানুষ আর একটা বানর হারিয়ে দিল! অবশ্য আপন মেজাজে চলা আর কোনও কিছুকে গ্রাহ্য না করাই তো রাবণোচিত স্বভাব।

রাবণের নারীর প্রতি মনোভাব জানত সকলেই। তাই প্রথমে অকম্পন তাঁকে সীতাহরণের প্ররোচনা দেয়। রাবণ মারীচের কাছে গেলে মারীচ রামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝিয়ে তাঁকে বিরত করে। দ্বিতীয়বার শূর্পণখা নিজের অপমানের কথা বলে সীতাহরণ করার জন্য সীতার রূপের বর্ণনা দিয়ে রাবণকে উত্তেজিত করে। এবার আর মারীচ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। বরং রাবণ তাকে ভয় দেখান, মারীচ সীতাহরণে সাহায্য না করলে তিনিই তাকে হত্যা করবেন। অগত্যা সোনার হরিণ হয়ে মারীচ সীতার কাছে যায়।

সোনার প্রতি এই আগ্রহকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে নতুনভাবে দেখিয়েছেন। রাবণের শক্তি আর দাপটের উৎস হচ্ছে সোনা। সেই সোনার মায়াতেই তিনি সীতাকে বিভ্রান্ত করে বশ করতে চেয়েছেন। সোনার প্রতি মায়া বা মরীচিকা যে সৃষ্টি করে সে মারীচ। একদিকে কর্ষণজীবী বা কৃষিসভ্যতার প্রতীক রামসীতা, আর একদিকে সোনা দিয়ে আকর্ষণ করানো আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক রাবণ ও রক্ষঃপুরী। কৃষিসভ্যতা ধীরে ধীরে বশ্যতা স্বীকার করছে বস্তুবিশ্বের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বাল্মীকির রামায়ণের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে লিখেছেন, কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্য সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে।[৩] বাল্মীকির সীতাও তাই পড়েছেন। সীতাকে একা পেয়ে তপস্বীর বেশে রাবণ সীতার কাছে যান এবং মুগ্ধ হন। তিনি সীতার কাছে নিজমুখে স্বীকার করেন, বহু দেশ থেকে বহুরকম নারী তিনি হরণ করে এনেছেন, কিন্তু সীতাকে দেখে তাঁর অন্য পত্নীদের প্রতি আর কোনও মোহ নেই। তাঁর বাসনা, সীতা হবেন তাঁর প্রধানা মহিষী। দেবতা-দৈত্যদের কীভাবে তিনি হারিয়েছেন সেকথা ক্রমাগত বলে সীতাকে তিনি প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। তাঁকে বিবাহ করলেই একমাত্র সীতা অযুত সুখে নিশ্চিন্ত

জীবন কাটাতে পারবেন। রাবণই তাঁর স্বামী হিসাবে একমাত্র যোগ্য—'অহং শ্লাঘ্যঃ পতিস্তব'। সীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই রাবণ এত কথা বলেন, নইলে শুধু বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইলে এসে তৎক্ষণাৎ সীতাকে তুলে নিয়ে গেলেই হত। সেটা রাবণ করেননি।

সীতা যখন কোনওভাবেই রাজি হলেন না, তখন তিনি বাঁ হাতে সীতার কেশ ধরে ডান হাতের উপর শুইয়ে ফেলে তাঁকে পুষ্পক রথে তুললেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লক্ষ্মণের কেটে-দেওয়া গণ্ডির কথা থাকলেও বাল্মীকি রামায়ণে গণ্ডির কথা নেই। তুলসীদাসের রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে গণ্ডির প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডে মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের কথোপকথনে গণ্ডির উল্লেখ আছে। সীতাকে নিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় নিজ বাসভবনের একটি বিলাসবহুল কক্ষে এলেন রাবণ। যদি কেউ সীতার কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করে তাহলে তাকে তিনি বধ করবেন, জানিয়ে চলে গেলেন। সীতার কাছে তাঁর রাক্ষসসত্তা কিছুটা হলেও প্রচ্ছন্ন, প্রেমপূর্ণ সত্তা যেন উঁকি দেয়। সীতা তাঁর মন হরণ করেছেন—'মনো হরসি মে রামে নদীকূলমিবাম্ভসা' (অরণ্যকাণ্ড, ৪৬।২১)—নদীর তরঙ্গ যেমন তীরকে ভাসিয়ে দেয়, তেমনই তুমি আমার মনোহরণ করেছ, মন ভাসিয়ে দিয়েছ। বারে বারে তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গি দেখিয়েছেন বাল্মীকি। এ কি শুধুই বোনের অপমানের প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা হতে পারে? সীতা ক্রমাগত রাবণকে কটুবাক্যে অপমান করে গেলেও তিনি তা গ্রাহ্য করেননি, ক্রোধ সংযত করে ধৈর্য ধরেছেন।

বহু বুঝিয়েও যখন ফল হল না, তখন সীতাকে অশোকবনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন রাবণ। রাক্ষসীদের আদেশ দিলেন, যেকোনও প্রকারে সীতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে যেন রাবণের প্রতি অনুরক্ত করে তোলা হয়। ভাবলেন ভয় দেখালে ফল হবে। তাই জানালেন, যদি একবছরের মধ্যে সীতা বিবাহে রাজি না হন, তাহলে সীতাকে টুকরো টুকরো করে তিনি প্রাতরাশ সারবেন। এখানে ভেবে দেখার অবকাশ আছে, যে-রাবণের অন্যকে জোর করাই স্বভাব, অন্যের ইচ্ছার পরোয়া না করে নিজের বাসনা চরিতার্থ করাই স্বভাব, সেই রাবণ সীতার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছেন—শুধু কবে সীতার মন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবে সেজন্য। তিনি বলেছেন, সীতা তাঁর পরম কামনার ধন হলেও সীতা না চাইলে তিনি তাঁকে স্পর্শ করবেন না। তাঁর কামনা তাঁর মধ্যেই থাকুক, সীতা চলুন নিজের ইচ্ছামতো—''এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি'' (সুন্দরকাণ্ড, ২০।৬)। পণ্ডিতেরা তাই বলেন, ''রাবণের কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলেও সেখানে ক্রোধের সৃষ্টি হচ্ছে না। সীতার প্রতি স্নেহ এবং দয়া আরও বাড়ছে। অন্তত রাবণ তাই বলছেন। তা হলে কি এটা শুধু কাম না অন্য কিছু!''[৪]

এমনও হতে পারে এ রাবণের কূটনৈতিক রাষ্ট্রনীতি—রাম এসে যদি দেখেন সীতা রাবণের প্রতি অনুরক্ত তাহলে রাম এমনিতেই পরাজিত হলেন। রাবণ বলেছেন, সীতার মতো দ্বিতীয় কাউকে তিনি ত্রিভুবনে দেখেননি, সীতা একেবারেই স্বতন্ত্র, অতুলনীয়া—'ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতা সদৃশী তথা' (যুদ্ধকাণ্ড, ১২।১৩)। সীতার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি শোকে অধীর। এতদিন ধরে সীতার করুণা প্রার্থনা করতে করতে তিনি অবসন্ন, ক্লান্ত। শ্রান্ত অশ্বের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন—'শ্রান্তোঽহং সততং কামাদ্ যাতো হয় ইবাধ্বনি' (পূর্বোক্ত, ১২।২০)। এ কি আশ্চর্য নয়? নারীর জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত, ইনি কোন রাবণ! বলা যেতে পারে, রাবণের মনে ছিল পূর্ববর্তী অভিশাপ। কিন্তু যদি বিপরীতটা ভাবা হয়? রাবণ অন্যান্য ক্ষেত্রে যা করতে অভ্যস্ত তা সীতার ক্ষেত্রে করতে তাঁর প্রবৃত্তি হচ্ছে না, সেইজন্যই অভিশাপের

অবতারণা কি? রাক্ষসের মধ্যে প্রেম থাকতে পারে না, এটি প্রতিষ্ঠিত করাই কি উদ্দেশ্য ছিল? রামের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধে যাওয়ার আগেও তাঁর মনে ভেসে ওঠে সীতার ছবি, ইচ্ছা করে একবার সীতাকে দেখে আসতে। নিশ্চিত বলা যায়, শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা চাপা পড়ে গিয়েছিল মনের এই আলোড়নের কাছে। সীতার কাছে তাঁর বীরত্ব, প্রভুত্ব, অহংকার সব লুটিয়ে পড়েছে। কাজি নজরুল যথার্থই রাবণের উক্তি রচনা করেছেন : ''হে মোর রাণী, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।/ আমার বিজয়কেতন লুটায় তোমার চরণতলে এসে।'' স্বয়ং বাল্মীকি রাবণের এই সমর্পণ দেখাচ্ছেন।

একদিকে হৃদয় অন্যদিকে মস্তিষ্ক। আকাঙ্ক্ষার ধনের কাছে পরাভব মেনে নিলেও মনে রাখতে হবে তিনি লঙ্কেশ্বর রাবণ। তাই রামের কাছে হার মানতে পারেন না তিনি। স্ত্রী মন্দোদরী তাঁকে বারবার বুঝিয়েছেন—রাম অপরাজেয়, সীতাকে ফিরিয়ে দিন, সন্ধি করুন। মাতা কৈকসী, বৃদ্ধ মন্ত্রী মাল্যবান তাঁকে বোঝান রামের সঙ্গে সন্ধি করে নিতে। এও বোঝান, রাম এবং বানরের দল দেবতা, যক্ষ বা রক্ষ নয়, তাঁকে তারা বধ করতে পারে রাবণের প্রাপ্ত বরের বাইরে গিয়ে। কিন্তু রাবণ তো রাবণই। শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করা তার স্বভাবে নেই। তাই বৃদ্ধ মাল্যবানকে বলেছেন, তিনি দুখণ্ডে ভেঙে পড়বেন তাও ঠিক আছে, কিন্তু কোনওভাবেই মাথা নত করবেন না—''দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ'' (যুদ্ধকাণ্ড, ৩৬।১১) কারও কাছে নত হতে তিনি শেখেননি, এই তাঁর আজন্ম স্বভাব, এই স্বভাবকে তিনি অতিক্রম করতে পারবেন না—''এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ'' (পূর্বোক্ত)। তবে দুশ্চিন্তা তাঁরও হচ্ছে। হনুমান এসে লেজের আগুনে অনেক ক্ষতি করে গেছে, অঙ্গদ রাবণের প্রাসাদশিখর ভেঙে দিয়ে গেছে, কিছুই করতে পারেননি তিনি। একে একে সব আত্মীয়, ভ্রাতা, পুত্র সবাই রামের হাতে নিহত হয়েছে। মাঝে মাঝে আফসোস হচ্ছে ব্রহ্মার বরদানের সময় মানুষের কথাটা বললেও হত, বিভীষণের কথাটা শুনলেও হত। একের পর এক মৃত্যুতে তিনি মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন, সীতাকেও হত্যা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু যে-প্রবাদবাক্যটি আছে—'অতিদর্পে হতা লঙ্কা', সেটি সম্পূর্ণ সত্য হয়ে উঠেছে। তিনি কখনও হারতে পারেন না—এই বোধ থেকেই প্রবল অহংকার তাকে গ্রাস করেছে।

সবশেষে এল রাবণের বিনাশকাল। রাবণকে হত্যা করতে গিয়ে রাম ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যতবার তাঁর মাথা কাটেন ততবার তাঁর নতুন মাথা বের হয়। কিছুতে যখন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন সারথি মাতলির পরামর্শে তিনি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্রেই রাবণের মৃত্যু হল। শারীরিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রাবণের মানসিক পরাজয় এক মুহূর্তের জন্যও হয়নি। কৃত্তিবাস তাঁর রাবণের মধ্যে এমন কাঠিন্য দেখাননি, এমন মৃত্যু দেখাননি। কৃত্তিবাসের রাম স্বয়ং নারায়ণ, মানুষ নন। তাই রামের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেখে রাবণ ভয় পেয়ে তাঁর চরণে শরণ নেন। রাবণ কাতর হয়ে জানান—

''বৈকুণ্ঠের নাথ তুমি দেব অবতার।
আমি সেবক গোসাঞি দুয়ারে তোমার॥...
লক্ষ্মী ঠাকুরাণি সীতা তাহা আমি জানি।
সীতা আনি দীন প্রাণ রাখ চক্রপাণি॥
পরম দয়ালু তুমি অনাথের গতি।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি মতি॥''

এই কথা বলে রাবণ সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আনতে যান, কিন্তু দেবতাদের চেষ্টায় উন্মাদ বায়ু তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পুনরায় রামকে আক্রমণ করতে এলে রাম তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে হত্যা করেন। বাল্মীকির রাবণের যাবতীয় তেজ-গর্ব ভূলণ্ঠিত করেছেন কৃত্তিবাস। তুলসীদাস তাঁর

রামচরিতমানসে কৃত্তিবাসের মতোই রামকে অবতার আর রাবণকে শত্রু হয়ে ভজনাকারী উদ্ধারপ্রার্থী হিসাবেই দেখিয়েছেন। রামচরিতমানসের অরণ্যকাণ্ডে রাবণ বলেন,

''সুরঞ্জন ভঞ্জন মহিভারা।
জৌঁ ভগবন্ত লীহন অবতারা॥
তৌ মে জাই বয়রু হঠি করউ।
প্রভুসর প্রান তজে ভব তরউঁ॥''

—দেবতাদের আনন্দদায়ক ও পৃথিবীর ভারহরণকারী জগদীশ্বর যদি অবতার হয়েও এসে থাকেন, তাহলেও আমি শত্রুতাই করব, প্রভুর হাতে মরে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব।[৫] তুলসীদাস তাঁর গ্রন্থে রামকে সূর্য, সিংহ হিসাবে একাধিকবার দেখিয়েছেন; আর রাবণ সম্পর্কে জোনাকি, শশক, ভেক, শৃগাল, কুকুরের মতো নিকৃষ্ট উপমা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অঙ্গদের চোখ দিয়ে রাবণের বিশালত্বকেও তিনি দেখিয়েছেন। লঙ্কাকাণ্ডে দেখি, রাবণের হাতগুলি যেন গাছ, মাথা যেন পর্বতশৃঙ্গ, রোম যেন অনেকগুলি লতা, মুখ নাক চোখ কান যেন পর্বতের গহ্বর ও খাদ। এই বিশালত্ব দেখানোর পরেও অঙ্গদ রাবণকে সম্বোধন করে বিপথগামী, স্ত্রীচোর, খল, মলিনতাপুঞ্জ, দুর্বুদ্ধি, কামাতুর ও নরখাদক হিসাবে। এই বিশেষণগুলি দিয়েই সাধারণ পাঠক রাবণকে বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত। এই বিশেষণ রাবণের সম্পর্কে প্রযোজ্যও। তুলসীদাস দেখিয়েছেন যে, রাম বনবাসী তপস্বী, অন্যদিকে রাবণ অযুত ঐশ্বর্যের মালিক। তবু বানরসেনা নিয়েই অহংকারী শক্তিশালী রাক্ষসসেনাকে রাম বধ করেছেন। অর্থাৎ অহিংসা দিয়েও হিংসাকে জয় করা যায়। আসলে বাল্মীকির রাম-রাবণ মানুষ ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকটির কথা উল্লেখ করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদে মানবকাহিনির সেই একই রূপ হুবহু ধরে রেখেছেন। রাজশেখর বসুর সারানুবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কৃত্তিবাস তাকে নিজের মতো করে ভক্তিরসে পরিবর্তন ঘটান। তুলসীদাসও তাঁর গ্রন্থে মানুষের কথা বলেননি, বলেছেন দেবতার কথা। তাঁরা দুজনেই ভক্তিরসে সিক্ত করেছেন কাব্য, মানবরসে নয়। তাই বীর্যবান রাবণ সেখানে প্রচ্ছন্ন, ভক্তিমান রাবণ কিছুটা হলেও শেষে প্রকট।

মধুসূদন আধুনিক যুগের আধুনিক কবি। তাই ভক্তি নয়, রাবণের শক্তিকে তিনি অবলম্বন করেছেন। বাল্মীকির রামায়ণই তার আধার। রাবণ যেভাবে হার না মেনে বারবার লড়াই করেন সেটাই মধুসূদনকে মুগ্ধ করেছিল। রাবণের অটল মনোভাবের বিপরীতে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যুদ্ধের সময় রামকে সাহায্যের জন্য—

''কুবের বরুণ অগ্নি যম পুরন্দর।
সভ দেবগণ বসিলা আকাশ উপর॥''

দেবতাদের এই পক্ষপাতের জন্যই মধুকবি লিখেছেন, ''I despise Ram and his rebel; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow।''[৬] কীভাবে রাবণকে নিয়ে তিনি প্রথার বাইরে গিয়ে এমন একটা উলটো ভাবনা ভেবে তাকে কাব্যরূপ দিলেন, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়! মধূসূদন না থাকলে বাংলার পাঠককুল কি এমন নতুন ভাবনার আস্বাদ নিতে পারতেন? অবশ্য মেঘনাদ মারা যাওয়ার পর রাবণের বিলাপ বাল্মীকি-কৃত্তিবাস সবস্থানেই এক। পিতৃহৃদয়ের এই হাহাকার মধুসূদন নিপুণভাবে গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদে রাবণ বলেন, ''হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য আমায় করিতে হইবে? রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত

আছে, এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে!" রাবণের এই দিকটি আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত এবং গৌণ ছিল। মধূসূদন আমাদের ভাবিয়েছেন, রাবণ কি শুধুই রাজা? মানবিক দৃষ্টিতে দেখলে তিনি তো পিতাও। তাই বাল্মীকির কাব্যের হাহাকার মধুকবি রূপ দিয়েছেন এইভাবে—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা!"

(মেঘনাদবধ কাব্য, নবম সর্গ)

মধুসূদন রাবণকে করুণরসে জারিত করেছেন। নানা সময় রামায়ণকে নানাভাবে রূপ দিয়েছেন নানা কবি; সকলেরই মূল আধার মহর্ষি বাল্মীকি।

এখন প্রশ্ন এই, রাবণকে পরাজিত হতে হল কেন? হনুমান প্রথমে রাবণকে 'মহাত্মা' সম্বোধন করেছিলেন। বিভীষণের কাছে শোনা যায়, দশানন দাতা, বীর, তপস্বী, ভোগী, বেদান্তবিদ, বিদ্বান ও অগ্নিহোত্রী। তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল, দেহকান্তি বৈদূর্যমণিতুল্য এবং রাজোচিত লক্ষণযুক্ত। নীল মেঘের মতো ছিল তাঁর সুবিশাল নীল দেহ। হনুমান তাঁকে দেখে বলেছিলেন, রাক্ষসরাজের আশ্চর্য রূপ, আশ্চর্য ধৈর্য ও অদ্ভুত পরাক্রম। বিচিত্র তাঁর দেহদ্যুতি, ইনি সর্বাধিক সুলক্ষণযুক্ত। তাঁর অধর্ম যদি প্রবল না হত, তবে তিনি দেবতাদেরও অধিপতি হতে পারতেন। দশ হাজার হাতি, দশ হাজার রথ, বিশ হাজার অশ্ব, এক কোটি বলবান শস্ত্রপাণি নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও রাবণ পরাজিত হলেন শুধু দুর্বিনীত, উদ্ধত, অহংকারী, কামী স্বভাবের জন্য। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদ (অহংকার)—এই চারটি ভয়ানক রিপুর অধীন ছিলেন তিনি। বাল্মীকি সেই দিকটিই দেখিয়েছেন। মধুসূদন রাবণের দৃপ্ত দিকটি দেখিয়েছেন। মহাকাব্য লেখার সময় পাপ-পুণ্য-ঔচিত্যের দিক দেখাতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। তাঁর অঙ্কিত রাবণের ব্যক্তিসত্তা পাঠকের কাছে প্রিয় হয়েছে। বাল্মীকির রাক্ষস রাবণ থেকে কৃত্তিবাস-তুলসীদাসের শরণাগত রাবণ হয়ে মধুসূদনের মানুষ রাবণের এই যাত্রাপথ উপভোগ্য, সুখপাঠ্য এবং আকর্ষণীয়।

তথ্যসূত্র

১। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ৮, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৬৮৯ [এরপর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*]

২। দ্রঃ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *রামায়ণী*, আনন্দ, ২০২১, পৃঃ ১৭১ [এরপর, *রামায়ণী*]

৩। দ্রঃ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ৮, পৃঃ ৭১৬

৪। *রামায়ণী*, পৃঃ ২০২

৫। দ্রঃ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও অনুদিত গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণ, খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৩৫২, কলকাতা, পৃঃ ৪১১

৬। মধুসূদন দত্ত, *রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯, সাহিত্যসাধনা, পৃঃ ৩৩

সহায়ক গ্রন্থ

১। *বাল্মীকিকৃত রামায়ণম্*, অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা : ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, নিউলাইট, কলকাতা, ভাগ ১ (১৯৯৬), ভাগ ২ (১৯৯৭)

২। দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণী কথা, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১২১৭

৩। সুখময় ভট্টাচার্য, *রামায়ণের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৩

৪। কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭